দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৯৭

তারিখ 09 Sep 1990
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

পরীক্ষার ফল হতাশাব্যঞ্জক

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফল গত বৃহস্পতিবার ঢাকা হইতে একসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে। পাসের হার এযাবৎ-কালের সর্বনিম্ন শতকরা মাত্র ৩১ দশমিক ৭৩ ভাগ। চারটি বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল সবসুদ্ধ ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ১৮ জন। পাস করিয়াছে ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩ শত ১৭ জন এবং ফেল করিয়াছে ৩ লক্ষ ৭ হাজার ৬ শত ১ জন। বলাবাহুল্য, পরীক্ষায় যাহারা কৃতকার্য হইয়াছে তাহাদের অনেকে অত্যন্ত মেধাবী, কেহ কেহ ৫।৬টি 'লেটার'সহ বহু নম্বর লাভ করিয়াছে। শুক্রবারের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে তাহাদের কাহারো কাহারো হাস্যোজ্জ্বল ছবি ছাপা হইয়াছে। তবে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে পরীক্ষায় অকৃতকার্য তিনগুণ ছাত্র-ছাত্রীর ব্যর্থতা। অকৃতকার্য এই ৩ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলের বহির্গমন দ্বার অতিক্রম করিতে হইলে তাহাদের পরবর্তী পরীক্ষায় আবার অবতীর্ণ হইতে হইবে। ইহাদের মধ্যে সকলেই যে সে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে সক্ষম হইবে তাহা মনে হয় না, বিভিন্ন কারণে অনেককেই হয়তো পরীক্ষার পূর্বেই সংসার সমুদ্রে পাড়ি জমাইতে হইবে।

মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার ফলাফলের এ নিম্নগামিতা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। ১৯৭২ সাল হইতে পরীক্ষায় অবাধ সুযোগ প্রদানের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের পাসের হার বৃদ্ধি পাইয়াছিল ঠিকই; কিন্তু অন্যদিকে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ধসিয়া পড়িয়াছিল—ইহাও সত্য। বিশেষতঃ নকল করিয়া যখন ভাল পাস কিংবা ক্লাস পাওয়া যায় তখন ছাত্র-ছাত্রীরা কষ্ট করিয়া সারা বছর লেখাপড়া করিবে কেন? পক্ষান্তরে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ না দিলে যখন ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ নম্বর পাইয়া পরীক্ষায় পাস করিয়া যায় তখন শিক্ষকরাইবা কেন পরিশ্রম করিয়া তাহাদের লেখাপড়া শিখাইবেন। বস্তুতঃ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের এই বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের পরিণতিতে আমাদের দেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষণের মানই যে শুধু ধসিয়া পড়িয়াছে তাহা নয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই পাস করা তরুণদের মধ্যে, তাহা সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হউক কিংবা সে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হউক, মানসম্পন্ন লোক খুব কমই পাওয়া যায়। তবে বিগত কয়েক বছর যাবৎ পরীক্ষায় নকল বন্ধের যে উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আশা করা গিয়াছিল, ইতিমধ্যে ইহার একটি সুফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু এবছরের পরীক্ষার ফল দেখিয়া হতাশই হইতে হইয়াছে। পরীক্ষার ফল এত শোচনীয় কেন হইয়াছে, উচ্চ পর্যায়ে তাহার তদন্ত হওয়া আবশ্যক। তবে আমাদের ধারণা, পরীক্ষায় এই খারাপ ফলাফলের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বাংশে দায়ী নয়, বিশেষ করিয়া শিক্ষকরাও অনেকাংশে দায়ী। প্রথম শ্রেণী হইতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পড়ানো, তাহাদের নিকট হইতে পড়া আদায় করার যে বিঘোষিত রীতি-নিয়ম রহিয়াছে তাহা কত স্কুলে অনুসৃত হয়, এ প্রশ্ন যেমন করিতে হয় তেমনি এ প্রশ্নও করা যায়, শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের যথারীতি প্রশিক্ষণ দান না করিলে কিংবা দায়িত্ব পালনে ফাঁকি দিলে বোর্ডের তরফ হইতে তাহাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়ার কোন বিধান রহিয়াছে?

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রহিয়াছে, সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভ সত্ত্বেও তাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ও যথার্থ শিক্ষা দান করেন না। ফলে পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতকার্য হইতে ব্যর্থ হয়। অভিযোগটি সত্য হইয়া থাকিলে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসন উভয়ই পরীক্ষার এই খারাপ ফলাফলের জন্য দায়ী। বাংলাদেশে পড়াশুনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। গৃহশিক্ষক ছাড়া পরীক্ষায় ভাল ফলাফল আশা করা দুরাশামাত্র। এ অবস্থাটি তীব্রতর হইয়াছে একশ্রেণীর শিক্ষকের বিশেষ আচরণের জন্য। তাঁহারা ক্লাসে পড়ানোর চাইতে পড়া নেন বেশী। ফলে বাড়ীতে পড়া তৈরী করার জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ না করিয়া উপায় থাকে না। তাই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের না পড়ানো কিংবা না পড়াইয়া পড়া আদায় করার প্রবণতা সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া দিতেছে বলিলে বেশী বলা হইবে না। সে জন্য কেবল নকলের উপর জোর দিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যান্য ত্রুটিপূর্ণ দিক উপেক্ষা করিলে শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট দূর করা সম্ভব হইবে না। শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, এমনকি নিজেদের দিকেও দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। কেননা, ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বলতা-দুর্নীতি সর্বত্র বিরাজমান। এগুলি দূরীভূত করিয়াই তরুণদের ভবিষ্যৎ আলোকিত করিতে হইবে।